পূর্ব থেকে পশ্চিম
পর্বঃ ১০

'নিউইয়র্ক সিটি'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটি নিউইয়র্ক স্টেটের রাজধানী নয়, তার ধারেকাছের কিছুও নয়। নিউইয়র্ক স্টেটের বর্তমান রাজধানী 'আলবেনী'। অথচ ১৭৮৫ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত পুরো যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিলো এই নিউইয়র্ক শহর। সাধারণের কাছে 'আলবেনী' খুব একটা পরিচিত নাম নয়, কিন্তু সারা বিশ্বে একনামে পরিচিত 'নিউইয়র্ক শহর'। ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন, ক্যুইন্স, ব্রুক্লিন এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ড এই পাঁচটি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত এই শহরের জনসংখ্যার পরিমাণ জানতে কোনো পরিসংখ্যানের দরকার পড়ে না। পাবলিক বাস কিংবা ট্রেনে উঠতে গেলেই টের পেয়ে যাবেন। নানা বর্ণের, নানা গোত্রের, নানা পেশার মানুষের সম্মিলনস্থল এই শহরের নামের আগে কি বিশেষণ দেয়া যায় সেটাই রীতিমত এক ভাবনার বিষয়।অথবা বলতে পারেন 'নিউইয়র্ক' শব্দটা নিজেই এখন একটা বিশেষণ।

ইউএসএর অন্য শহরগুলিতে যত ভালো করেই ইংরেজি বলার চেষ্টা করেন না কেন, তাদের বুঝতে একটু না একটু সমস্যা হবেই।কিন্তু এই শহরে যা-কে যা-ই বলেন, দেখবেন সহজে বুঝে ফেলছে। সম্ভবত এদেরকে এত বেশি পরিমাণ উপমহাদেশীয় ইংরেজী শুনতে হয় যে, এরা নিজদের ইংলিশ ভুলে গিয়ে উপমহাদেশীয় ইংলিশে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে সে যাই হোক, এখানে এসে সবচেয়ে যেটা ভালো লাগবে, সেটা হলো দেশের মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ। প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশি এখানে আছে।অনেক বাংলাদেশী তথাকথিত ভদ্রলোককে অনেক সময় বলতে শুনেছি, বাংগালিদের যন্ত্রণায় নিউইয়র্ক শহরে হাঁটাচলায় করা যায় না। কিন্তু মুখে যতই বলুক না কেন, অন্তরের গভীরেতো তাদের সেই বাংলাদেশ আর বাংঙ্গালি। তাই যতই যন্ত্রণাই করুকনা কেন, ঘুরেফিরে সবাই ফিরে ফিরে আসে সেই নিউইয়র্ক শহরেই। জাতীয়তার টান উপেক্ষা করবে, ততটুকু বিবর্তন মনে হয় মানব মনে এখনো ঘটে উঠেনি।

এখানে বাংলা আছে, আছে বাঙ্গালি, আছে সিঙ্গাড়া, সমুচা, বেগুনী, পেয়াজু, ভাত, ডাল, আলুর ভর্তা; আর যেটি না থাকলেই নয়, সবার আগে আছে বিখ্যাত আওয়ামীলীগ-বিএনপি। এদের জীবনধারার সাথে একাকার হয়ে মিশে গেছে হাসিনা-খালেদা। এখানকার সবচেয়ে সাধারণ মানুষটিকেও দেখেছি নিউইয়র্কের মাটিতে বসে নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রীর চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়ছেন, আবার সবচেয়ে অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষটিকে দেখেছি জাতির পিতামাতাদের দেখা স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের পিছনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবার জন্য একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত এর নামই গণতন্ত্র। কোন একটা বিষয় নিয়ে মাঠ গরম করে ফেলতে আমাদের তুলনা নেই। তাই পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও নিউইয়র্কের বাঙ্গালিপাড়াগুলো থাকে উত্তপ্ত।

বেশিরভাগ বাংলাদেশি এখানে যে-কাজ করেন সে-কাজ তারা নিজেরাই পছন্দ করেন না। কষ্টকর কাজ, নিজের অপছন্দে বাধ্য হয়ে করা কাজ। সত্যি বলতে গেলে, একটা কথা অনেককেই বলতে শুনেছি, কিছুটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সবাই বলছেন, 'আমাদের আর জীবন।' নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী ভবনের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি, 'হায় জীবন! কোনটা যে জীবন, কি যে সেই জীবনের অর্থ।' তারা বলে, 'এখানে ভালো লাগে না, একদম ভালো লাগে না, দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে, দেশে গিয়ে কিছু করব, এখানে আর না।' কপালে অস্বস্তির ছাপ রেখে যখন তারা আরো বলে, 'আর কতদিন এখানে অর্থহীনভাবে জীবন চালিয়ে যাবো?' তখন তাদের সাথে আমিও হয়তো ভাবি, 'এমনটাই যদি হবে, তবে কেন এই জীবন? কেন এখানে পড়ে থাকা?' উত্তর খুঁজে পেতেও আমার দেরী হয় না।পালানোর কিংবা সান্ত্বনা খুঁজে পাবার সেই পুরোনো অজুহাত। যে-লোকট এতক্ষণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে দেশে ফেরবার কথা বলছিলো, সেই একই লোক এখন কি এক অপূর্ব স্বর্গীয় হাসি হেসে বলছে, বলছে তার আট বছরের সন্তানের কথা, বলছে তার স্কুলে পড়বার কথা।একটু আগের বলা কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলছে, 'না দেশে যাবো না। এখানে যত কষ্টই হোক, অন্তত আমার সন্তানের ভবিষ্যততো অনিশ্চিত না।' আমি আবারো বুঝতে চেষ্টা করি জীবন আর সেই জীবনের অর্থ?'

নিউইয়র্কের বিখ্যাত সব ভবন আর অফিসগুলো রয়েছে ম্যানহাটনে। ম্যানহাটনের জাতিসংঘের ভবণ প্রাঙ্গণে গিয়ে কিছুটা অস্থির হয়েই খুঁজতে থাকলাম; আর সব পতাকার ভীড়ে খুঁজতে থাকলাম আমার দেশের পতাকা। দেশের রাস্তায়, দোকানে, টি-শার্টের পিছনে কত দেখেছি এই পতাকা। কিন্তু এমনটাতো কখনো মনে হয়নি, এমনটাতো লাগেনি কখনো। বুঝতে পারি, এই পতাকাই কত বড় সম্বল। একটা স্বাধীন দেশ যে কি বিশাল পাওয়া, বুঝতে পারি আবারো। বুঝতে পারি, 'মাতৃগর্ভে থেকে মা'কে কখনোই চেনা যায় না, মা'কে চিনতে হলে সত্যিই মাতৃগর্ভের বাইরে আসতে হয়।' রাত-দিন দু'বেলাতে দু'রকম দেখতে এই ম্যানহাটন। দিনের বেলা সুউচ্চ সব ভবনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে, গভীর রাত্তিরে একটু দূর থেকে ম্যানহাটনের দিকে তাকাতে গেলে মনে হয়, এই বুঝি কোন স্বপ্নের দেশে চলে এলাম, এই বুঝি ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মনে হয় কোন সিনেমা হলে ব'সে থ্রি-ডি কিংবা অ্যানিমেশান ম্যুভি দেখছি। যত যান্ত্রিক আর যত কৃত্রিমই হোক না কেন, ম্যানহাটনের চোখ ধাঁধানো এই সব স্থাপত্য আর ঝলমলে সাজ আপনাকে আপ্লুত করবেই।বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, ভিন গ্রহের কোনো প্রাণি এসে তৈরী করেনি এই শহর। মানুষই তৈরী করেছে, আমরা মানুষরাই নির্মাণ করেছি এই শহর, এই নগর।

এই ছোট্ট পরিসরে নিউইয়র্ক শহরের বর্ণনা দেয়া আসলে বৃথা চেষ্টা। নিউইয়র্ক নিজেই একটা সভ্যতা, তাই সেই সভ্যতার বর্ণনা এখানে দেয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। শিকাগো ফেরার দিন বিমানবন্দরে পৌঁছে দেয়ার সময় রাহাত খান বলে যায়, বলে যায় তার জীবনের কথা। বলে যায়, তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাংলাদেশে, এখানে তিনি স্থায়ীভাবে থাকবেন না, চলে যাবেন বাংলাদেশে। আমি

স্তব্দ হয়ে ভাবতে থাকি, সত্তোরোর্ধ্ব রাহাত খান, আজো তিঁনি করেন ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, ভবিষ্যতে তিনি ফিরে যাবেন দেশে। সত্তর বছর বয়স এখনো একটা মানুষের বর্তমান।আমি জানি রাহাত খানদের সেই ভবিষ্যত কোনো দিনও আসবে না। উন্নত জীবনের লোভও মানুষের একটা বিশেষ লোভ। তাই মানুষ জীবনকে অস্বীকার করে ছুটে চলে, ছুটে যায় আরেক জীবনের কাছে, তথাকথিত উন্নত জীবনের কাছে। যেখান থেকে ফিরে আসা অনেক অনেক কঠিন।

প্লেনের জানালায় তাকিয়ে, আমি দূরে চেয়ে থাকি। এমনি করে একদিন আমি ফিরে যাব আমার নিজের দেশের পথে।যে-দেশকে আমি নিজের বলে ভাবতে পারি, জানতে পারি, মানতে পারি। ফিরে যাবো পদ্মা-মেঘনার কাছে; সাদা বকের কাছে, বাঁশঝাড়, আলু-পটলের খেত, সরিষার মাঠের কাছে; ফিরে যাবো রোদ-বৃষ্টি-মেঘের কাছে, শাপলার শালুকের বাতাবির কাছে; ঝিঙ্গে সীম নারিকেল, পুকুরের কাছে; জোনাকির কাছে, তারা ভরা রাতের কাছে, কোকিলের কাছে, দোয়েলের কাছে, শীত বসন্তের কাছে। কোথা থেকে যেন হঠাকিছু শুনতে পাই , আমি শুনতে পাই, ডাক শুনতে পাই। মনের ভেতর বেজে বেজে উঠে - ‘বুকে তোমার, বুকে তোমার ঘুমিয়ে গেলে, জাগিয়ে দিয়ে নাকো আমায়, জাগিয়ে দিয়ে নাকো, মা’গো, এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো; জন্ম আমার ধন্য হ’লো মা’গো।’

(সমাপ্ত)

*সবাই ভালো থাকুন আর ভালো থাকুক আমার শব্দগুলি; অন্তর্জালের মহাসমুদ্রে আজ থেকে যারা সম্পূর্ণ একা

পরশপাথর
জানুয়ারী ২১, ২০১০
Poroshpathor81@yahoo.com